নিবেদিতার স্বপ্ন

প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা

নিবেদিতার ভারত আগমনের পশ্চাতে একটি নির্দিষ্ট 'মিশন' ছিল, কিন্তু তিনি 'মিশনারি' ছিলেন না। তথাকথিত মিশনারিদের মতো এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণকে তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে যেতে আসেননি। এসেছিলেন সুপ্রাচীন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও পূজার মনোভাব নিয়ে।

নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির যথার্থ তাৎপর্য কী অথবা আগামী প্রজন্মের প্রয়োজনে সে কোন ভূমিকা গ্রহণ করবে—এসব নির্ণয় করার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, নিবেদিতা সেযুগের লন্ডনে 'নবীন শিক্ষান্দোলন'-এর সঙ্গে যুক্ত অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজস্ব ধ্যানধারণার আলোকে বিদ্যালয়ের সূচনাপর্বেই তার অনন্য ভূমিকার ইঙ্গিত তিনি করেছিলেন।

প্রশ্ন জাগে, নিবেদিতার মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী নারীকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুল খুলে অ-আ-ক-খ শেখানোর কাজে কেন আহ্বান জানিয়েছিলেন? মনে হয়, স্বামীজীর সে-আহ্বানের পশ্চাতে বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনটি মুখ্য ছিল না। এখানে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। এক, বিদ্যালয় শুরু হওয়ার আগে স্বামীজী মার্গারেট নোবলকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে 'নিবেদিতা' নাম দিয়েছিলেন। দুই, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং, শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে যিনি ছিলেন সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক শক্তির পালয়িত্রী। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, স্বামীজী চেয়েছিলেন ছেলেদের মতো মেয়েদের জন্যও একটি মঠ স্থাপন করতে।

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে স্বামী সারদানন্দ বিদ্যালয়ের যে-প্রথম কার্যবিবরণী (১৯০৫-১৯১২) প্রকাশ করেন তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা হয়েছে : ''বিদ্যালয়ের সামান্য সূচনায় প্রস্তাবিত স্ত্রীমঠের 'ভূমিকা' রচনা হল।'' স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভব সেই স্ত্রীমঠ স্থাপিত হল আরও ছাপ্পান্ন বছর পরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে।

নিবেদিতাকে কেন্দ্র করে যে-অল্পসংখ্যক ত্যাগব্রতী মেয়েরা সমবেত হন, তাঁরা বিদ্যালয়ের কাছেই একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। তাঁরা তাঁদের

আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন 'মাতৃমন্দির' এবং সন্ন্যাসিনীর মতোই জীবনযাপন করতেন।

নিবেদিতার প্রতি স্বামীজীর নির্দেশ ছিল—ভারতীয় মেয়েদের জাতীয়ভাবে দেশীয় ঐতিহ্য বজায় রেখেই শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র নারীমুক্তির জন্য আসেননি, তিনি জনগণেরও ত্রাণকর্তা। স্বামীজীর এই ভাবনাই নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল একটি বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা।

স্বামীজী চেয়েছিলেন মানুষ তৈরির শিক্ষা। নিবেদিতা সেটিকে জাতিগঠনের দিকে প্রসারিত করেন। সেইদিক দিয়ে বিচার করলে এই বিদ্যালয়টি ছিল তখনকার দিনে ভারতের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ের মেয়েরা প্রতিদিন প্রার্থনার সময়ে গাইত 'বন্দে মাতরম্'—ব্রিটিশ সরকার যে-সংগীতের ওপর তখন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহারেও নিবেদিতার আগ্রহের সীমা ছিল না। তাই কোনওরকম দ্বিধা না করে তিনি লেডি মিন্টোকে (তৎকালীন ভাইসরয়ের পত্নী, ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে আসেন) আপ্যায়িত করেছিলেন স্বদেশি কাপ-ডিশে স্বদেশি চা, চিনি ও বিস্কুট দিয়ে। তখন ভারতীয়দের ঘরে ঘরেও ওই স্বদেশি বস্তুর কোনও কদর ছিল না। আবার লেডি মিন্টো যখন ১৯১০-এর ১৮ মার্চ নিবেদিতাকে গভর্নমেন্ট-হাউসে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তখনও নিবেদিতা এক প্যাকেট স্বদেশি বিস্কুট (লেড়ো বিস্কুট) সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। এটি বোধহয় নিবেদিতার পক্ষেই সম্ভব!

একথা সুনিশ্চিত যে, ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের বিদেশ থেকে শেখার বিশেষ কিছুই নেই, বরং দেওয়ার মতো সম্পদ অনেক আছে। আমাদের সমাজে অবশ্য বর্তমানে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাজে নতুন কিছুর প্রবর্তন ভারতীয়রা নিজেরাই করবে। কোনও বিদেশির তো সে-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

তিন হাজার বছরে গড়ে ওঠা এই সভ্যতা কি এতই গুরুত্বহীন যে, পশ্চিমের তরুণজাতি প্রাচ্যের মানুষকে দিগ্‌দর্শন করাবে! ইউরোপে সভ্যতার জন্ম তখনও হয়নি। সেই সুপ্রাচীন কালেই ভারতবর্ষ সভ্যতার মূলভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করেছিল। সভ্যতার শেষ কথা ঐশ্বর্য, শক্তি অথবা সংগঠন নয়, সভ্যতার অর্থ মানুষকে উচ্চতর মূল্যবোধে জাগ্রত করা, সূক্ষ্ম মহত্তর কৃষ্টির সঞ্চার করা এবং সেইসঙ্গে গড়ে তোলা উদার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি।

ভারতীয় মেয়েরা অজ্ঞ—এমন ভুল ধারণা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। বরং ভারতীয় মেয়েদের সমুন্নত চারিত্র্যমহিমা, তাদের মর্যাদাবোধ, কোমলতা, হৃদয়-মনের উৎকর্ষ যা তারা নিজেদের সহজ-সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই লাভ করেছে—সেগুলিই তো জাতীয় জীবনে মহার্ঘ্য সম্পদ! হয়তো আধুনিক পরিভাষায় তারা অশিক্ষিত, কারণ তারা নিজের ভাষায় একটি শব্দও পড়তে শেখেনি, নিজের নাম সই করা তো দূরের কথা! তা সত্ত্বেও শিক্ষা মানুষকে যা দেয়, নিবেদিতার মতে, সেযুগের ভারতীয় মেয়েরা তথাকথিত শিক্ষালাভ না করেও তা সহস্রগুণে বেশি অর্জন করেছিল। ভারতে নারীত্বের আদর্শ রোম্যান্স নয়, ত্যাগ। প্রাচ্যদেশের পক্ষে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করার কোনও আবশ্যকতা নেই। বিদেশের রীতিনীতি, শিষ্টাচারকে অনুসরণ করার হীন মনোভাব থাকবে কেন? পরস্পরের সৌহার্দ্য যেখানে আছে সেখানে হাতজোড় করে নমস্কার জানালাম অথবা করমর্দন করলাম—তাতে কী আসে যায়!

নিবেদিতা চাইতেন, ভারতের তরুণরা যেন মনে রাখেন যে, জগতের অন্য কোথাও, আর কোনও জাতির মধ্যেই ছাত্রজীবনের এত উচ্চ ব্রহ্মচর্যের

আদর্শ নেই। নিবেদিতা আশা রাখতেন—প্রতিটি ছাত্রই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। শাসকশ্রেণির চাপে লেখা এক বিপরীত এবং অর্ধসত্য ইতিহাসের মোহে না পড়ে, তারা যেন স্বদেশকে অখণ্ডরূপে দেখতে শেখে। অন্যান্য জাতির কাছে ভারতের জবাবদিহি করার কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের ছাত্রেরা যেন নিজেদের সাহিত্য—বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে বিকশিত জাতীয় প্রতিভার সমাদর করতে শেখে। নিজেদের অমূল্য শিল্পসম্পদের প্রতি তরুণসমাজের ঔদাসীন্যে নিবেদিতা কত ব্যথিত হতেন, তা আজ আমরা কল্পনায় আনতে পারি না। তিনিই সেদিন ভারতের শিল্পীদের উৎসাহ দিয়ে প্রেরণাদাত্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের জাগরণে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে এক মুক্ত দিগন্ত খুলে দিলেন। নিবেদিতার কাছে শিল্পীরা ছিলেন অনন্ত স্বপ্নের সান্ত রূপকার।

ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়ার অন্তর্দৃষ্টি নিবেদিতার ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল সেখানেই রহস্যের চাবিকাঠি—যা ভারতবর্ষকে সমস্ত ধর্মসমূহের জননী করেছে। বারবার দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—পুরুষের চেয়ে মেয়েদের ওপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ বেশি নির্ভর করছে।

আমাদের দেশ আজ মহা বিপদের সম্মুখীন। দেশজননী বিশেষ করে এই শুভক্ষণে তাঁর মেয়েদের আহ্বান করছেন। তাঁরা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে সে-আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন।

আজকের ভারতীয় মা যেন তাঁর মেয়েদের মধ্যে একটি পবিত্র জীবনযাপনের প্রেরণা জাগ্রত করেন—যার অভাবে জাতি আজ তার অন্তরের শক্তি ও বীর্য হারিয়ে ফেলেছে।

প্রত্যেক মা যেন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সন্তান মহৎ হবে। মায়েরা যেন সন্তানের অন্তরে অপার সহানুভূতি জাগিয়ে তোলেন যাতে তারা অন্যের দুঃখকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে।

নিবেদিতার শক্তিশালী লেখনীতে আমরা যেন স্বামীজীরই মহান আহ্বান শুনতে পাই : ''আমরা যেন আমাদের সন্তানদের অন্তর দেশ ও জাতির চিন্তায় পূর্ণ করতে পারি। আমরা দেখতে চাই, আমাদের সন্তানেরা ভারতের জন্য আত্মত্যাগ করছে। তারা ভারতকে ভালবাসুক, জ্ঞান অর্জন করুক ভারতেরই কল্যাণসাধনে। ভারতকে যেন তারা ভারতের মঙ্গলের জন্যই চাইতে শেখে। এইসব ভাব তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো প্রবাহিত হোক।''

এতটাই ছিল নিবেদিতার আশা, নিবেদিতার স্বপ্ন। তাঁর প্রিয় স্বদেশমন্ত্রটি উচ্চারণ করেই শেষ করি। তিনি তাঁর ছাত্রীদের ওই মন্ত্রটি ধ্যান করতে ও বারবার আবৃত্তি করতে বলতেন জপমন্ত্রের মতো। সে মন্ত্র হল : 'বন্দে মাতরম্'—ভারতমাতা, তোমায় প্রণাম করি।''

---

৬ নভেম্বর ১৯৯৮ সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের ছাত্রীদিবসে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে পূজনীয়া মাতাজীর ভাষণ, নিবোধত ১২ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।